tricontinental

সাক্ষাৎকার – ঐশী ঘোষ

ঐশী ঘোষ --- কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরোধিতায় ডাকা ছাত্র-যুবদের মিছিলে ,
মান্ডি হাউস ০৩/০২/২০২১ --- ফোটোগ্রাফ সৌজন্য --- সামীম আসগর আলী

তখনও মাস্ক পরে থাকা বাধ্যতামূলক হয়নি এ দেশের প্রতি প্রান্তরে। তখনও মুখ ঢেকে রাখা আবশ্যিক হয়নি মারণ ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে। তাও হঠাৎ-ই বেশ কিছু মাস্ক পরিহিত লোকের উদ্ধত চলাফেরার ছবি জে এন ইউ ক্যাম্পাসের - বলা যেতে পারে ছবি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে আসা মাত্রই তাজ্জব বনে যেতে হয় গোটা দেশবাসীকে। হাতে তাদের প্রত্যেকেরই লোহার রড, ক্রিকেট ব্যাট। তাদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি আমাদের অবাক করে। কোনো মারণ ভাইরাসের হাত থেকে রেহাই পেতে না – নিজেদের লজ্জাজনক কাজের থেকে মুখ লুকাতে মাস্ক পরে তারা এন্ট্রি নিয়েছিল এ দেশের অন্যতম যুক্তির চর্চাকেন্দ্র জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চত্বরে। নৃশংস আক্রমণ চালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর। ভাঙচুর চলে ক্যাম্পাসের মধ্যে – ইঁট কাঠ পাথরের বিল্ডিং দিয়ে ঘেরা এ ক্যাম্পাস কেবল ক্যাম্পাস না – নিজেদের ঘর। অনাহুত কিছু লোক সে ঘরে এসে হঠাৎ-ই ভেঙ্গে তছনছ করতে থাকে। এমন কি হস্টেল, লাইব্রেরিও ছাড় পায় না। টেলিভিশন মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়ার স্ক্রিনের এ পারে বসে আমরা অসহায় ভাবে দেখতে থাকি ,শুনতে থাকি এক দল ছাত্রছাত্রীর চিৎকার – কিন্তু এক পা পিছু হটে না অসভ্যদের হাত থেকে নিজের ক্যাম্পাসকে বাঁচানোর তাগিদে। দাঁতে দাঁত চিপে, রক্ত ঝরিয়ে নিজের ক্যাম্পাসকে আগলাবার প্রাণপণ বাঁচাবার চেষ্টা দেখি

ওদের প্রত্যেকের দৃপ্ত চোখমুখে। মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে দেখি আমরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার – বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত ছাত্রসংসদের প্রেসিডেন্টের – ঐশী ঘোষের। ফেসবুকে স্ক্রল করতে করতে আগের ছবি মনে না থাকলেও আমাদের মেমরি স্ক্রল করলে এখনো সেদিনের ঘটনা সেভ হয়ে আছে সবদিনের জন্য। আমাদের মনে আছে। মনে থাকবেও। ডিলিট করে দেওয়ার কোনো অপশন আমরা রাখিনি। সেদিন কেবল একা ঐশী ঘোষ নয়, সেদিন এরকম অনেক ঐশী ঘোষ মিলে দেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় নতুন একটা অধ্যায়ের ভূমিকা লিখতে থাকে নিজেদের রক্ত দিয়ে – ভারতীয় জনতা পার্টির মত একটি মনুবাদী কুসংস্কারে ভরা ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ করা একটি দক্ষিণপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে ছাত্রদের লড়াই আন্দোলন। এ হেন শক্তির সাথে লড়াইয়ে কীভাবে সম্মুখ সমরে নামতে হয় তার জন্য প্রস্তুত হতে শেখায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীরা।

আমরা জানি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে গণআন্দোলনে ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেও একটি সংগ্রামের ঐতিহ্য বহমান। JNUSU -র নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের নূন্যতম ভূমিকা থাকে না। ছাত্রসংসদ নির্বাচনের শেষপর্বে জে এন ইউ তে রাত জেগে চলা presidential debate (প্রেসিডেন্সিইয়াল ডিবেট) বরাবরই দেশজোড়া আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। দেশ তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতি, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা,ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর নয়া উদারবাদী চেতনার হামলা প্রভৃতি এই বিতর্কের বিষয়বস্তুতে উঠে আসে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জে এন ইউ এর ছাত্র আন্দোলনের উপর নানাবিধ আক্রমণ হয়েছে এবং কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির বর্তমান সরকার আসার পর বিগত কয়েকবছর এই আক্রমণ অনেক বেশি তীব্রতা লাভ করেছে।বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রগতিশীল ধ্যানধারণা থেকে নির্বাচিত ছাত্রসংসদের নেতৃত্ব সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হামলার শিকার। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ঐশী ঘোষ তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (abvp) প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে ছাত্রসংসদের সভাপতি নির্বাচিত হন।এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রের ক্ষমতার অধীন দক্ষিণপন্থী সরকার ও তাদের অনুগামী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের চোখে এই নব নির্বাচিত ছাত্রসংসদ বিরাগভাজন হয় এবং ক্যাম্পাসের উপর তারা ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনে।

২০২০ সালের ৫ ই জানুয়ারী ক্যাম্পাসে তখন ছাত্রসংসদের নেতৃত্বে অযৌক্তিক কোর্স ফি সহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে, এমন সময়ে প্রকাশ্যে প্রায় দিনের আলো থাকতেই থাকতেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে মাস্কধারী (করোনা পূর্ববর্তী কালে) গুন্ডাবাহিনী। তাদের হাতে লোহার রড, লাঠি, ক্রিকেট ব্যাট।দিনের আলো থেকে অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত তান্ডব চলে ভারতের প্রথিতযশা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।ছাত্রস্বার্থে এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত সম্মান রক্ষার্থে ঐশী ও তার সহকর্মীরা বাধা দেন এই নৈরাজ্যের এবং গুরুতরভাবে আহত হন।

এ সাক্ষাৎকার ঐশী ঘোষের। এই সাক্ষাৎকারে ঐশী কথা বলেছেন শতরূপা চক্রবর্তীর সাথে তার ছাত্র রাজনৈতিক জীবন এবং ওঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে ।

প্র : - আপনি কিভাবে ছাত্র রাজনীতি তে এলেন ?

উ : - আমার জন্ম পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে । আমি ছোট থেকেই একটা বামপন্থী রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বেড়ে উঠেছি । আমাদের দুর্গাপুরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন খুবই শক্তিশালী ছিল । আমার বাবা বরাবর বামপন্থী রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন । আমি দেখেছি তাদের লড়াই । বাবার সাথেও আমার কথা হতো কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ক্ষতি করছে এইসব নিয়ে ।

এরপরে আমি স্নাতকস্তরের পড়াশুনো করতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলতরাম কলেজে আসি । এখানেই আমার দেশের উচ্চশিক্ষার হাল হকিকত নিয়ে প্রথম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হয় । সরকার যদি শিক্ষাকে সুলভ না করতে চায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে দরিদ্র, আদিবাসী, দলিত, মহিলা, সংখ্যালঘু এইসব অংশ থেকে আসা মানুষরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন না, সুতরাং পুরো ব্যবস্থাটাই যে কিরকম একপেশে এবং বৈষম্যে ভরা তা আমার নিজের চোখে দেখা । হোস্টেল এর অভাব - একটা বিরাট সমস্যা ডি ইউ তে ।

আমি কলেজে পড়ার সময়ের দুটো অভিজ্ঞতার কথা বলবো। আমি তখনো সক্রিয় রাজনীতিতে আসিনি । একবার হঠাৎ ক্যাম্পাসে ছাদ ভেঙে পরে। ছাত্রদের স্বাভাবিক কারণেই খুব রাগ হয় এবং আমরা প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করি । এটা তো ছাত্রদের ন্যায্য দাবী । অবাক করার মতো বিষয় হল আমাদের বামপন্থী বলে ঘোষণা করে দেওয়া হলো । আরেকবার হঠাৎ করে ফী ৫,০০০ থেকে বাড়িয়ে ১৬,০০০ করে দেওয়া হলো । প্রশাসনের এইধরণের সিদ্ধান্ত যে শুধু স্নাতকস্তরের ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধেয় ফেলে তা নয় ,

স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়ারাও এর আওতায় আসেন । কোনো কলেজের ছাত্রদের তো ৩০,০০০ টাকা অব্দি বার্ষিক ফী দিতে হয়েছিল । ফী নির্ধারণে কলেজগুলো নির্বিচারে নিজেদের গা জুয়াড়ি করে এবং বিক্ষোভ জানাবার কোনো উপায় ডি ইউ তে নেই । ছাত্র সংসদ একেবারেই অচল। ছাত্রদের কোনো ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে তারা আন্দোলনে যেতে পারে না । আমাদের ভোট কেনার জন্য ডি ইউ এর দক্ষিণপন্থী ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্ব ডোমিনোজ থেকে পিৎজ্জা বা কে এফ সি থেকে খাবার খাওয়াতেও কোনোরকম কুণ্ঠাবোধ করত না। এবং এই কাজগুলি তারা করত শুধু আমাদের ভোট কেনার জন্য।

কিন্তু ২০১৬ সালে যখন জে এন ইউ তে পড়তে এলাম, একটা আকাশ - পাতাল পার্থক্য অনুভব করলাম। বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির একটা দীর্ঘ ইতিহাস থাকার জন্যে যে, ক্যাম্পাসটা ছাত্রদের অধিকার সম্পর্কে কতটা সংবেদশীল হতে পারে সেটা নিজে না দেখলে বুঝতে পারতাম না । এখানে এসে, বিশেষত একজন মহিলা ছাত্র হিসেবে বলছি, একটা স্বাধীনতার আস্বাদন আছে। আমি যত রাতই হোক না কেন ক্যাম্পাসে প্রয়োজনে বেরোতে পারি। আমায় যদি আমার মেয়ে হওয়ার জন্যে কোনো ভেদাভেদের শিকার হতে হয়, আমি নির্দ্বিধায় আমার ছাত্র প্রতিনিধি কে যোগাযোগ করতে পারি । সেখানে কোথাও এটা ছোট সমস্যা বলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা নেই । হ্যাঁ , এখন যারা প্রগতিশীল, বামপন্থী রাজনীতি করেন, তাদের কাছ থেকেই এটাই আশা করা যায় ।

বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত আর ডানপন্থীদের দখলে থাকা ছাত্র সংসদের মধ্যে তফাৎ টা যে কতটা গভীর আর তীব্র, সেটা নিজে না দেখলে বুঝতে পারতাম না । এবং আমার মনে হয় যে ডি ইউ বা জে এন ইউ এর বাইরেও সারা দেশের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি । ছাত্রাবস্থায় যারা রাইট-উইং রাজনীতির সাথে জড়িত হন অনেকেই শুধুমাত্র নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথাটা মাথায় রাখেন ।

প্র : - জে এন ইউ তে বামপন্থী রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের কথা, আপনার নিজের অভিজ্ঞতা এগুলো যদি আরেকটু বলেন----

উ : - আমার মতে ছাত্র রাজনীতির বা ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো ক্যাম্পাসে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা। একমাত্র তাহলেই আমরা সুনিশ্চিত করতে পারবো যে সব অংশের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে ক্যাম্পাসে। জে এন ইউ তে সেই আন্দোলনের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের লড়াইয়ের একটা ইতিহাস আছে । আমাদের ছাত্র সংসদের নির্বাচন প্রক্রিয়াই তার একটা উদাহরণ। পুরো নির্বাচনটাই পরিচালনা করেন ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত কমিটি । আমাদের লড়াই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটিও খুবই গণতান্ত্রিক। এখানে একদম নিচের স্তর থেকে জি বি মিটিং করা হয় । আমরা যখন ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করি তখন ছাত্রদেরও অধিকার থাকা উচিত তাদের মতামত প্রকাশের । এখানে ডিবেট এবং ডায়ালগ এর একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রয়েছে । ক্যাম্পাসে আমরা সব সংগঠন আমাদের কথা বলার মাধ্যম হিসেবে একটা হাতিয়ার পোস্টারিং কে ব্যবহার করে থাকি। পুরো ক্যাম্পাসটাই পোস্টারে ঢাকা থাকে যার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের রাজনৈতিক কথা, সংগঠনের মতাদর্শের কথা, আমাদের দাবিদাওয়ার কথা বলি। আপনারা হয়তো জে এন ইউ র ধাবা culture এর কথা শুনেছেন । এখানে অনেকগুলি ধাবা রয়েছে যেগুলো অনেক রাত অব্দি খোলা থাকে। সেখানে সব অংশের ছাত্ররা নানান রকমের আলাপ আলোচনা করেন । অনেক ছাত্রের ক্ষেত্রেই এইরকম space গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যেখানে তারা হয়তো প্রথমবার কোনো প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা শোনেন ।

ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হলো এই ক্যাম্পাস এর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব। সেরকমই একটি কমিটি হলো জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন কমিটি , যে কমিটি যে কোনো ধরণের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এর ঘটনার বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এ নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। জি এস ক্যাশে ছাত্র, শিক্ষক , কর্মচারী সব অংশের প্রতিনিধিরাই ছিলেন। ক্যাম্পাসে নতুন ছাত্ররা এলে নানারকম জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন work-shop করা হতো । এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কিন্তু অন্য যেকোনও ক্যাম্পাস এর সাথে ফারাক বুঝতে সাহায্য করে, বিশেষত ডি ইউ র সাথে । ওখানে সন্ধ্যে ৬টার পরে বেরোতে অস্বস্তি হতো , অথচ জে এন ইউ তে কোনোদিন ভাবতেই হয়নি ।

২০১৭ র ১৮ ই সেপ্টেম্বর হঠাৎ করে প্রশাসন জি এস ক্যাশ কে সরিয়ে ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস কমিটি (আই সি সি) নাম একটা কমিটি বসায় । এটি আদ্যন্ত প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত একটি কমিটি যার সাথে ক্যাম্পাসের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনো যোগ নেই । সঙ্গত কারণেই মহিলারা একেবারেই উৎসাহিত বোধ করেন না আই সি সি তে তাদের অভিযোগ জানাতে

। ঠিক সেই সময় একটি স্কুল এ আট জন মহিলা গবেষক একজন প্রভাবশালী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনেন। আই সি সি সেই অধ্যাপককে পূর্ণ রূপে shield করে। এটা একটা উদাহরণ যে গণতান্ত্রিক উপায়ে যদি ক্যাম্পাস না চলে তাহলে ছাত্রস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ চালানো কতটা সহজ হয়ে যায় ।

জে এন উ ছাত্র-সংসদের ডাকা 'শিক্ষা বাঁচাও' মার্চ,
১২/০৮/২০২০ --- ফোটোগ্রাফ সৌজন্য অজানা

প্র : - আপনি ইন্টারভিউয়ের শুরুতে ফী বৃদ্ধির কথা বলছিলেন । আপনি নিজে জে এন ইউ এস ইউ এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফী বৃদ্ধির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আমরা দেখেছি ২০২০ সালের ৫ই জানুয়ারী ক্যাম্পাসের ওপরে হামলাও হয় । যদি একটু বলেন -------

উ: - ফী বৃদ্ধি শুধু ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সীমাবদ্ধ নয় । বিশ্বজোড়া নয়াউদারনীতিবাদের পরিণাম হচ্ছে এটা । ল্যাটিন আমেরিকার চিলিতে এর বিরুদ্ধে লড়াই আর দক্ষিণ আফ্রিকার ফী মাস্ট ফল আন্দোলনের কথা তো আমাদের জানা। আসলে স্বাস্থ্য , শিক্ষা , প্রবীণদের যত্ন এসব sector গুলোই আজ ধুঁকছে । একটা সমাজ কতটা গণতান্ত্রিক বা প্রগতিশীল তা বোঝা যায় এসব সেক্টরগুলোর প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি দেখলে ।

শিক্ষাক্ষেত্রের যাতে ফী কম থাকে, যাতে করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্ররা উচ্চশিক্ষায় আসতে পারেন তার দাবিতে লড়াই আমাদের দেশে অনেকদিন ধরেই চলছে । জে এন ইউ তে প্রত্যেক সেমিস্টারে ২৮৩ টাকা ফী নেওয়া হয় । এর ফলে আমার মত একটা বিরাট অংশের মানুষ যাদের বেশি টাকা দিয়ে পড়ার ক্ষমতা নেই, তারা পড়তে পারেন । এটা শুধুমাত্র টিউশন ফী নয় , এর থেকে হোস্টেল এবং লাইব্রেরি ইত্যাদি সুযোগ সুবিধেও জড়িয়ে আছে । কম খরচে পড়াশুনো, থাকার ব্যবস্থা একটা বড়ো কারণ যার জন্য বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে আসা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর ছাত্ররা এই প্রতিষ্ঠানটিতে পড়েন ।

উপবৃত্তি বৃত্তি এবং ফেলোশিপও পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এটা কিন্তু কোনো সরকারি দোয়া নয় । এটা আমাদের দেশের পিছিয়ে পড়া অংশের অধিকারের প্রশ্ন ।তাই যখন জে এন ইউ প্রশাসন হঠাৎ করে ফী বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, স্বাভাবিক কারণেই ছাত্রসংসদ থেকে আমাদের আন্দোলনে যেতে হয় । শিক্ষকরাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন । সরকার যদি শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করতে চায় তাহলে সেটা তো গণতন্ত্রেরই হত্যা ।

প্র: - বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও গবেষণার প্রতি বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে আপনি কিভাবে দেখেন ?

উ : - বিজেপি সরকারের আমলে যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সব থেকে তীব্র আক্রমণ হয়েছে । মিথ্যাচার, অযৌক্তিক মনোবৃত্তি এবং ভ্রান্ত ধারণাকে ইতিহাস বলে প্রচার করতে এদের জুড়ি নেই । তলায় রামমন্দির আছে বলে প্রচার করে বাবরি মসজিদ ধংস করার ইতিহাস তো আমাদের জানা ।

বর্তমান সরকারের অনেক নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা যেসব বিবৃতি দিয়ে চলেছেন সেটা অবাক করার মতন । কেউ বলছেন গরুর গায়ে হাত বোলালে ক্যান্সার ঠিক হয়ে যায় তো কেউ গোমূত্রকে সব রোগের ওষুধ বলে দাবি করছেন । অশ্বিনী কুমার চৌবে --- যার অধীনে আয়ুর্বেদ, যোগ, ন্যাচারোপ্যাথী , হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি সব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে, তিনি এটা দাবি করলেন। অযুক্তি এবং অন্ধবিশ্বাসের বিস্তার একটা গভীর চিন্তার বিষয় । অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণা যারা করছেন এখন আমাদের দেশে, তারা আর্থিক অনুদান থেকে ল্যাবরেটরি সংক্রান্ত নানান সমস্যায় জর্জরিত। কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরাও আন্দোলনে নামেন ফান্ড এর দাবিতে।

আসলে এরা যেকোনো রকম বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণাকেই ভয় পায়। কারণ সেটা যদি ঠিক থাকে তাহলে এদের মুখোশ খুলে পরে যাবে। সমাজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা তো আরো ক্ষতিগ্রস্থ ও উপেক্ষার শিকার হয়েছে এ সময়পর্বে। অথচ তথ্যনির্ভর গবেষণায় আমরা দেখেছি যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াইয়ে আরএসএস এর কোনো ভূমিকা ছিলো না। বরঞ্চ তাদের ইতিহাসটা হলো আপোষের ইতিহাস। ধুঁকতে থাকা সমাজ বিজ্ঞান, বিশেষত ইতিহাস চর্চা সব সময় দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্রকে মদত যোগায়।

আমি যখন M.Phil করতে আসি ৫,০০০ টাকা মাসিক অনুদান পেতাম। এরমধ্যে হোস্টেলে মাসে ৩০০০ টাকা বিল দিতে হতো। হাতে ২০০০ টাকা নিয়ে বাকি মাস চালাতে হত গবেষণার খরচ সমেত। আমাদের রিসার্চের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক জার্নাল ইউনিভার্সিটি সাবস্ক্রাইব করে না। লাইব্রেরিতেও অনেকে সময় সব বইপত্র পাওয়া যায়না। এটা দেশের অন্যতম নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা।

ছাত্র-সংসদ নির্বাচন---মনোনয়ন দাখিল করার পর মিছিল,
২০১৯ ---- ফোটোগ্রাফ সৌজন্য---- অমিত কুমার

প্র: - ৫ই জানুয়ারির আক্রমণের ঘটনা কি ভাবে স্মরণ করবেন ?

উ : - ওই একটি দিনের কথা বলার আগে আমি কিভাবে জে এন ইউ এর ওপরে বিগত কয়েক বছর ধরে একটা সামগ্রিক আক্রমণ চলছে তা একটু বলতে চাই। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরেই একটা দমনমূলক আচরণ দেখানো হয়েছে বারে বারে। ২০১৬ সালে শুরু হয় আরএসএস এবং বিজেপির সংগঠিত আক্রমণ - shut down JNU তারই একটা উদাহরণ। পুরো একটা ইউনিভার্সিটিকে anti- national বলে প্রচার করে দেওয়া যে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এরই সাথে বলতে চাইবো হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির কথা। আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয় রোহিত ভেমুলার মৃত্যুকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা বলতে। আসলে এই সরকার চায় না বিরুদ্ধ কোনো কণ্ঠস্বর থাকুক এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে রোহিতের মতন সামাজিক অবস্থান থেকে ছাত্ররা পড়তে আসুক।

এবারে আসি ৫ই জানুয়ারির কথায়। ওটা হয়েছিল আরএসএস এবং সরকার এর উদ্যোগে। স্পষ্ট মদত যোগায় ক্যাম্পাসের প্রশাসন আর দিল্লি পুলিশ। আসলে উদ্দেশ্য ছিল ফী বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমাদের যে আন্দোলন চলছিল তার থেকে দৃষ্টি ঘোরানো। একরকম দিল্লি পুলিশ আর প্রশাসনের হেফাজতে ক্যাম্পাস ঢোকে মুখোশধারী জে এন ইউ - এবিভিপি এবং আরএসএস এর গুন্ডারা। তারা একইভাবে বিজয় উল্লাস করতে করতে বেরোয় ইউনিভার্সিটি চত্বরের বাইরে। এর সঙ্গে জড়িত হয় সরকারি মদতপুষ্ট মিডিয়ার কারসাজি। মুহূর্তের মধ্যে প্রচার শুরু হয়ে যায় যে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি ক্যাম্পাসে হিংসার পরিবেশ তৈরি করছে।

কিন্তু এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই আন্দোলনের শুরু থেকেই বহুবার শারীরিক আক্রমণ নামানো হয়েছে আমাদের ওপরে। আমরা যে লং মার্চ করেছিলাম ক্যাম্পাস থেকে HRD মিনিস্ট্রির উদ্দেশ্যে, সেখানেও দিল্লি পুলিশ একইরকম ভাবে ছাত্রদের পেটায়।

প্র: - এই ঘটনা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে প্রভাবিত করেছে ? এবং ভবিষ্যতে ছাত্র আন্দোলনের নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আপনি নিজে কোথায় দেখেন ?

উ : - আমাকে লোহার রড দিয়ে মারা হয়েছিল। হ্যাঁ, ভয় তো লেগেছিলো। আমাকে হাসপিটালে ভর্তি করা হয়। প্রচুর হুমকি এবং অশালীন কথাবার্তাও বলা হয়। বিচলিত হয়েছিলাম। কিন্তু একইসাথে প্রচুর মানুষ সহানুভূতি আর ভালোবাসা জানান। সেসব আমায় লড়াইয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়। কিন্তু আমি এটাও বলতে চাই যে জে এন ইউ দিল্লিতে অবস্থিত হওয়ায় খবর দ্রুত পৌঁছায়। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোজ হামলা হচ্ছে। সব খবর আমরা পাইনা। কিন্তু আমরা একে অন্যকে অনুপ্রাণিত করছি । এই লড়াইয়ে আমরা কেউই একা নয়।

আর রাজনীতিতে আসার আগের আমি আর এখনকার আমির মধ্যে অনেক তফাৎ। শুধু একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও আমি আজ অনেক সমৃদ্ধ। আমি নিশ্চিত যে আমার ভবিষ্যতের রাজনৈতিক জীবন গণআন্দোলন থেকে অনেক কিছু শিখবে।